রাজ্যেশ্বর মিত্র

রামনিধি : একটি বিস্মৃত প্রতিভা

১৩৯৮ বঙ্গাব্দের ২১ চৈত্র কিছুদিন পূর্বে গত হয়েছে। এই তারিখে ১২৪৫ বঙ্গাব্দে স্বনামধন্য গীতিকার রামনিধি গুপ্ত ৯৭ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১১৪৮ বঙ্গাব্দে। আজ থেকে দেড়শো বছর আগে তিনি পরলোকগত হয়েছেন। আমি যেখান থেকে বসে লিখছি তারই একশো গজ দূরে ২০ নম্বর নন্দরাম সেন স্ট্রিটের বাড়িতে তাঁর দেহান্ত হয়। এ অঞ্চল তখন কলকাতা নামে পরিচিত হয়নি, এই পল্লীর নাম ছিল সুতানুটি। অদূরে সুপ্রশস্ত গঙ্গা; নিধুবাবুর জন্মের মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে সুতানুটির চাঁপাতলা ঘাটের কিছু দক্ষিণে জোব চারনক তাঁর জাহাজ নঙ্গর করেছিলেন। তখন এ অঞ্চল অরণ্যাবৃত না হলেও বহু বৃক্ষে এবং বাগানে পরিবৃত ছিল। রাস্তা-ঘাট সবই গ্রামের মতন; পাল্কি তখন একমাত্র যান। এছাড়া লোকে ঘোড়ায় চড়ে দূরবর্তী স্থানে যাতায়াত করতেন। রাত্তিরে পথঘাট নিরাপদ ছিল না; অন্ধকারে মশাল জেলে লোকজন নিয়ে যাতায়াত করতে হত। রাত একটু বেশি হলে যাঁরা যেখানে থাকতেন সেখানেই থেকে যেতেন। অবস্থা ছিল মধ্যবৃগীয়; সন্ধ্যা হলে বেশ্যাদের ব্যবসা জমে উঠত, সুতানুটির বাণিজ্যপ্রধান অঞ্চলে লোকের অর্থাভাব ছিল না। সময়টা মন্দ কাটছিল না, কিন্তু বর্গীদের উপদ্রবে কলকাতা বিপদাপন্ন হয়ে পড়ল। গঙ্গায় খাল কেটে বাগবাজার আর সুতানুটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল। বালক রামনিধি কয়েক বৎসরের জন্যে হুগলির চাপতাগ্রামে বাস করে লেখাপড়া শিংতে আরম্ভ করলেন তখন নবাব আলিবর্দীর রাজত্বকাল; তিনি বর্গীদের সম্পূর্ণভাবে শাসন করতে সমর্থ হলেন। সুতানুটির শান্তি আবার ফিরে এল নিধুবাবু কৈশোরেই ফিরে এলেন তাঁর নন্দরাম সেন স্ট্রিটের বাসভবনে।

নিধুবাবুরা বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ ছিলেন। সেই সময়েই তিনি ইংরেজ পাদ্রির কাছে ইংরেজি শেখেন এবং পরে ইংরেজিতে তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেন। এ ছাড়া, সংস্কৃত, ফার্সি তো সকলকারই শিক্ষণীয় ছিল এবং তিনিও এ দুটি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব ছিল বাঙলাভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন। তখন বাঙলার প্রতি লোকের বিশেষ মনোযোগ ছিল না; কাজকর্ম চলত ফার্সিতে, ইংরেজরা তাঁদের ভাষা-জানা লোক খুঁজতেন এবং মাইনেও ভাল দিতেন। কিন্তু এই যুগে বাস করেও নিধুবাবু বাঙলার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং সারাজীবন বাঙলা গান রচনা করে এবং গেয়ে কাটিয়ে গেলেন।

গান তিনি কলকাতায় বসেই শিখেছিলেন, কিন্তু কার কাছে কীভাবে শিখেছিলেন জানা যায় না। তখন কবিগানের যুগ, কিন্তু নিধুবাবু তাতে আকৃষ্ট হননি। প্রথমত যাঁরা কবি গাইতেন তাঁদের রুচি এবং সমাজকে তিনি ভাল চোখে দেখতেন না। শ্রেণী হিসেবেও তাঁরা অনেক নিচে ছিলেন। কবির দলে যাবার মতন শ্রেণী থেকে তিনি উদ্ভূত হননি ; যথেষ্ট উচ্চ সম্প্রদায়ের বৈদ্য পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

পলাশির যুদ্ধের আরও কয়েক বৎসর পরে বিরাট দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ; তারও পরে তিনি কোম্পানির একটি ভাল পদ পেয়ে ছাপরার কালেকটারিতে যোগ দেন। এই ছাপরাতেই তিনি টপ্পা গানের সঙ্গে পরিচিত হন। এখানেই তিনি বাঙলা গানে টপ্পা এবং খেয়ালের রীতি প্রয়োগ করে এক নতুন রাগধর্মী সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ হন।

বহু বৎসর ছাপরায় কাটিয়ে অনেক টাকা নিয়ে তিনি যখন কলকাতায় ফিরলেন তখন তিনি প্রৌঢ়ত্বে অগ্রসর হয়ে গেছেন। কিন্তু সেই বয়সেই নতুন করে সংসার পাতলেন। তাঁর শেষ তৃতীয় বিবাহে সন্তানাদি হয় এবং তিনি তাঁদের ভাল করেই মানুষ করেছিলেন। তাঁর জীবন সম্বন্ধে নানা রটনা আছে। একসময় তিনি মদ্যপান করতেন এবং স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও তাঁর কিছু দুর্নাম ছিল। শ্রীমতী নামে একটি গণিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে অনেক আলোচনাও অনেকে পড়েছেন। কিন্তু ক্রমে তিনি সব সংসর্গই পরিত্যাগ করেন। শেষ বয়সে সঙ্গীতের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন এবং তারও পরে যতদিন বেঁচেছিলেন, কেবলমাত্র লেখাপড়া নিয়ে থাকতেন। তিনি মিশুক স্বভাবের লোক ছিলেন না এবং ক্রমে একান্তভাবে আত্মগত হয়ে পড়েন। মৃত্যুর বছর তিনেক আগে স্বয়ং রামমোহন রায় আচার্য উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন একটি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করে দেবার জন্যে। নিধুবাবু সানন্দে এই মহাপ্রাণ বয়োকনিষ্ঠকে একটি উত্তম ব্রহ্মসঙ্গীত উপহার দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় নানা কারণে রামমোহন গানটি সমাজে গাওয়াতে পারেননি এবং তিনিও কিছুকালের মধ্যেই গত হলেন।

ছাপরা থেকেই নিধুবাবুর নাম কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি শুধু যে গীতিকার ছিলেন তাই নয়, উত্তম গায়ক ছিলেন। তাঁর গান শুনতে সেকালের স্বনামধন্য ব্যক্তিরা তাঁর আয়োজিত আসরে আসতেন, তিনি কারুর দ্বারস্থ হননি। লিরিক গানের সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রবাহ তিনি উন্মুক্ত করে দিলেন, যাকে অবলম্বন করে, পরবর্তীকালে গীতিসাহিত্য ও গীতকলা গড়ে উঠেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে সম্পূর্ণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে তিনি বাঙলার গীতসমাজের শীর্ষে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও সেই শূন্যস্থানে আর কাউকে বসানো সম্ভব হয়নি। তাঁর সমসাময়িক দুজন সঙ্গীতজ্ঞের নাম আমরা জানি,

তাঁরা হলেন কাঁসারিপাড়ার রাধামোহন সেন এবং কালিদাস চট্টোপাধ্যায় বা কালি মীর্জা। রাধামোহন পণ্ডিত মানুষ ছিলেন; তিনি সঙ্গীততরঙ্গ নামে একটি শাস্ত্রগ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন দীর্ঘকাল। কালি মীর্জা কলকাতায় থাকতেন না এবং কলকাতার গায়ক সমাজেও তেমন প্রতিপত্তি ছিল না। যদিও তিনি রামমোহনের সঙ্গীতগুরু ছিলেন, তথাপি রামমোহন নিধুবাবুকেই অধিকতর স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। এই তিনজনের রচনারীতিই কিন্তু অনেকটা এক ধরনেরই ছিল।

এই বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষটি প্রভূত খ্যাতিলাভ করলেও তদনুরূপ প্রতিষ্ঠা পাননি। তার কারণ সে যুগে সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ। সঙ্গীতকে লোকে পছন্দ করলেও গায়ককে মর্যাদা প্রদান করতেন না, গায়কেরা তখনও ভদ্র সমাজে অপাংক্তেয় ছিলেন! এর ফলে নিধুবাবুর একটি ছবি পর্যন্ত পাওয়া যায় না। এক ধরনের লোক ছিলেন যাঁরা চিরকাল তাঁর চরিত্রগত দুর্নাম রটিয়ে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্বেষ প্রণোদিত হয়ে যেখানে সেখানে নিধুবাবুর রচনার প্রতি অশোভন কটাক্ষ প্রদর্শন করেছেন, অথচ গীতরচনার ক্ষেত্রে প্রতিভার দিক দিয়ে তিনি নিধুবাবুর কাছেও যেতে পারেন নি। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক রটনা হচ্ছে নিধুবাবুর গানের অশ্লীলত্ব; অথচ এত সুমার্জিত সুরুচিপূর্ণ রচনা সেকালে আর কারুর রচনায় দেখা যায় না। যাঁরা গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রার গান উপভোগ করেছেন, তাঁরা নিধুবাবুর গান সম্পর্কে অশ্লীলত্ব আরোপ করলেন কোন বিবেচনায় তা বোঝা দুঃসাধ্য।

সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিশীলিত শিক্ষিত সমাজ রামনিধি গুপ্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন রয়ে গেছেন। যাঁর স্বীকৃতি হওয়া উচিত ছিল কাব্যসঙ্গীতের আদি কবি হিসাবে তিনি বিদ্বজ্জনের কাছে অবহেলা এবং নিন্দা ছাড়া আর কিছুই পেলেন না। তাঁর নামে কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়নি, কোনও রাস্তা পরিকল্পিত হয়নি, তাঁর কোনো স্মারক বলতে কিছু এই কলকাতার লোকেরা রেখে যাননি। গত শতাব্দীর নট-নটী নিয়ে অনেক প্রচার হয়েছে থিয়েটারের বাজে গান আজ ঘটা করে গাওয়া হয়; বহু বিশেষত্বহীন পুরোনো গান 'পুরাতনী' লেবেলে প্রচারিত হচ্ছে; কিন্তু নিধুবাবু এবং তাঁর অনুবর্তিগণের গান প্রচার করবার মতন শিক্ষা এবং নিষ্ঠা আজকালকার গায়কদের মধ্যে বিরল।

১৩৯৮ সনের ২১ চৈত্র এই সুতানুটির একটি গৃহে বসে এই কথাই মনে হচ্ছে যে একদা এই পল্লীর একটি বিরাট প্রতিভা কীভাবে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেলেন! দুর্ভাগ্যটা কাদের— সমগ্র বঙ্গবাসীর।□